ইংল্যান্ডের দিনগুলো

শোভন শামস্

হঠাৎ করেই জানতে পারলাম প্রায় একমাসের জন্য আমাকে ইংল্যান্ডে যেতে হবে। বাংলাদেশ থেকে বিলেত যাওয়ার কথা শুনতাম অনেক এখন আমারও বিলেত যাওয়ার সুযোগ এসেছে এটা ভাবতেই ভাল লাগল। সময়টা সেপ্টেম্বরের দিকে । ইংল্যান্ডে তখন আবার আমাদের দেশের তুলনায় বেশ ঠান্ডা আবহাওয়া । তাই শীতের প্রস্তুতির জন্য কেনাকাটা করতে গেলাম। ভিসার জন্য ব্রিটিশ এম্বেসীতে ইন্টারভিউ দিতে গেলাম। প্রয়োজনীয় ম্যাপ,পরিচয় পত্র ও আনুষংগিক কাগজ পত্র দিয়ে দিল এখানে । যাওয়ার অন্যান্য প্রস্তুতি চলছে সমানতালে । বাংলাদেশ বিমানে টিকেট করলাম । ঢাকা-ডুবাই-প্যারিস-লন্ডন । ডুবাইতে কয়েক ঘন্টার যাত্রা বিরতি আছে । তবে প্যারিসে সে সুযোগ নেই । এক ঘন্টা মাত্র সময় । ডুবাইর ভিসাও নিতে হবে । ইংল্যান্ডের ভিসা ও ডুবাই ট্রানজিট রুট হওয়াতে ডুবাই এর ভিসা পেতে কোন সমস্যা হয়নি। যথানিয়মে এয়ারপোর্টের ফর্মালিটিজ শেষ করে বাংলাদেশ বিমানে দ্বিতীয় বারের মত দেশের সীমানা পার হওয়ার প্রস্তুতি নিলাম । ডুবাই এয়ারপোর্টে বিমান সময়মত ল্যান্ড করল । মালপত্র হিথরো এয়ারপোর্ট এর উদ্দেশ্যে বুকিং করে দিয়েছি । ডুবাইতে হাতের ব্যাগ নিয়ে নামলাম, আলো ঝলমলে এয়ারপোর্ট । অনেক চেকিং ও অন্যান্য ফর্মালিটিজ শেষ করে ট্রানজিট লাউঞ্জে এলাম । ছয় ঘন্টার যাত্রা বিরতি এখানে, তেমন কোন কাজ নেই । তাই আস্তে আস্তে ডুবাইর বিখ্যাত ডিউটি ফ্রি শপ ঘুরে ঘুরে দেখছি কি কেনা যায় । ইলেক্ট্রনিক্স জিনিষের জন্য এই এয়ারপোর্ট ডিউটি শপ বিখ্যাত। এছাড়াও মিউজিক/ভিডিও প্লেয়ার খাবার দাবার, কসমেটিকস বই এসব পাওয়া যায়। সব কিছু এত সুন্দর ভাবে সাজানো যে পকেটে টাকা থাকলেই কিনতে ইচ্ছে করে । সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশন্ড এলাকা, অকৃপন আলোর বন্যা ,দিনরাতের কোন পার্থক্য নেই । এয়ার পোর্টে অপেক্ষা করার ব্যবস্থাও আছে। বিভিন্ন রুটের ট্রানজিট যাত্রীরা চেয়ারে বা সোফাতে বসে ঝিমুতে পারে । মাঝে মাঝেই লাউড স্পীকার এ প্লেনের আগমন ও সময় জানানো হচ্ছে । এছাড়াও প্রায় কিছুক্ষণ পরপর বড় বড় মনিটরে প্লেনের সময় দেখা যায় । সুন্দর ও অত্যাধুনিক সব ব্যবস্থা । ডুবাই থেকে মিনোল্টা ক্যামেরা কিনলাম । লাউঞ্জে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। লন্ডনগামী বিমানে উঠার সময় হয়ে যাচ্ছে। প্লেনের গন্তব্য প্যারিসের আর্লি বিমান বন্দর। মোটামুটি ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে বিমানে সময়টা কাটালাম। বিমান প্যারিসের মাটি ছুঁয়ে যাবে আইফেল টাওয়ার দেখা হবে না । কেমন যেন লাগল

। বিমান বন্দরে একঘন্টা যাত্রা বিরতি । ট্রানজিট যাত্রীদের নামার অনুমতি নেই। তাছাড়া ফ্রান্সের ভিসাও নেই । এক ঘন্টা বিমানে বসে রইলাম। বিমান বোর্ডিং ব্রিজের সাথে লাগানো ছিল । প্যারিস থেকে বিমান লন্ডনের হিথরো আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পথে উড়াল দিল । আধা ঘন্টার মধ্যেই হিথরো বিমান বন্দরে পৌঁছে গেলাম। বিশাল বিমান বন্দর এটা । ইউরোপের মধ্যে অন্যতম ব্যস্ত এই বিমান বন্দর, চারটা টার্মিনাল এখানে । ইমিগ্রেশন ফর্মালিটিজ শেষ করে লাগেজ নিয়ে বাইরে এলাম । আমার গন্তব্য কেন্ট এর রচেষ্টার শহর । লন্ডন থেকে ট্রেনে সেখানে যেতে হবে। টিউবে করে হিথরো থেকে একটা ট্রেন বদল করে আমরা ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে এসে পৌছালাম।

ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন, লন্ডন

ভিক্টোরিয়া ও চ্যারিংক্রস লন্ডনের দুইটা বড় ট্রেন ষ্টেশন । এখানে বিভিন্ন টিউব লাইনের ট্রেন ও ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ট্রেন চলাচল করে । এর মধ্যে টিউবে চলাচলের জন্য ম্যাপ নিয়ে নিলাম । পর্যটকদের জন্য অনেক ফ্রি বই ও ম্যাপ বিমান বন্দরে ও ট্রেন ষ্টেশনে ষ্ট্যান্ডে রাখা আছে । টিউব রেলের বা পাতাল রেলের বিভিন্ন সংকেত রং ও জোন সম্বন্ধে জানলাম । কাউন্টারে গিয়ে কেন্ট গামী ট্রেনের টিকেট কিনলাম । রচেস্টার ছোট শহর সেখানে এই ট্রেন থামে না। তাই কাছাকাছি বড় ষ্টেশন ছেএথাম এর টিকেট কিনলাম। বেশ পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর ট্রেন মানুষ তেমন নেই। আরামদায়ক চেয়ার ,সিটে গিয়ে বসলাম । ৪০ মিনিটের জার্নি টাইম , দুপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলছে ট্রেন । বেশ দ্রুত চলছে ট্রেনটা,সময়টা সেপ্টেম্বর মাস , চারিদিকে সবুজ ছোট ছোট পাহাড় এর ঢালে চাষাবাদ করা হয়েছে । ফসল ফলে আছে , মানুষ বা বাড়ীঘর তেমন নেই । ছোট ছোট শহর পার হওয়ার সময় কিছু ঘরবাড়ি ও মানুষ দেখা যায় ।

ছেএথাম ষ্টেশনে নেমে টেক্সি নিলাম । ঠিকানা দেয়াতে আমাকে রচেষ্টার নিয়ে গেল । রচেষ্টার শহরটা ছোট তবে বেশ সাজানো ,আমার থাকার জায়গা পাহাড়ের উপর। রাস্তা দিয়ে নীচে

নেমে গেলে আবাসিক এলাকা ও তারপর শহর। রাস্তার পথচারীর জন্য ফুটপাথ আছে । বাসাগুলো সবই প্রায় ডুপ্লেক্স টাইপ একই রকম দেখতে । গ্যারাজ আছে একটা, সামনে একচিলতে লন এবং লোহার গেইট এক ব্লক বা ২/৩ ব্লক নিয়ে একই রং ডিজাইন। ফুটপাতে রাস্তা পার হতে হলে সিগন্যালের ব্যবস্থা আছে । শব্দ ও সবুজ সিগন্যাল জ্বলে উঠলে সবাই রাস্তা পার হয় । শহরটা ছোট সবজায়গায় লিখা আছে 'নেবার হুড ওয়াচ' প্রতিবেশীরাই পুলিশের কাজ করে । এখানে হাইওয়েতে হাঁটার নিয়ম নেই ও হাইওয়েতে ফুটপাথ নেই ।

প্রথম উইকএন্ডে নাস্তা সেরে ভাবলাম ছেএথাম শহর ঘুরে দেখব বাস ষ্ট্যান্ডে এসে অপেক্ষা করছি। ১ ঘন্টা হয়ে গেল বাস আসে না,পরে টাইম টেবল দেখলাম সকালে ২টা বাস যায় আর কোন বাস নাই। সবকিছু হিসেব করে চলে এখানে। একজন স্থানীয় ইংরেজ দেখতে পেলাম হেঁটে আসছে তখন । তাকে বাসের কথা বলাতে বলল বিকেলে বাস যাবে, ছেএথাম মাত্র ১০ কিঃমিঃ, হেটেই যাওয়া যায় । সেও শহরে যাচ্ছে আমি যাব কিনা জানতে চাইল । দুজন গল্প করতে করতে রওয়ানা হলাম । রচেষ্টার থেকে ছেএথাম যেতে মধ্যে একটা ছোট শহর আছে । মানুষ তখনও ঘুমিয়ে আছে । কেউ উঠে নাস্তার আয়োজন করছে । মোটামুটি ঘুমন্ত শহর । রাতে সবাই ছুটির দিনের আনন্দ করেছে ক্লাবে, এখন ঘুমাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে ছেএথাম শহরে চলে এলাম । ১০ কিলো মিটার হেঁটে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম পথে মার্স-চকলেট বার ও পানি খেলাম। হাত ব্যাগে পানি ও এই চকলেট বারগুলো নিয়ে গিয়েছিলাম। এখানে এখন সবচেয়ে সুন্দর আবহাওয়া তবে আমার জন্য ৭/৮ ডিগ্রী তাপমাত্রা বেশ ঠান্ডা, তাই জ্যাকেট পড়ে ছিলাম, বাতাস খুব বেশী তাই ঠান্ডা ও লাগে সব সময় । শহরটা ছোট, দেখার তেমন কিছুই পেলাম না । রবিবারে এখানে সানডে মার্কেট বসে। সাধারণ লোকজন তাদের বাসা থেকে হাতে বানানো জিনিষ পত্র সোপিস,খাবার দাবার ইত্যাদি বিক্রি করে । দাম বেশ কম, জিনিষ গুলো সুন্দর। ফটোফ্রেম, ইকেবানা, ফুলের তোড়া ইত্যাদি সবকিছু এখানে পাওয়া যায় । কিছুক্ষণ শহরে ঘুরে ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এলাম । সপ্তাহে ৫ দিন কাজকর্ম ২ দিন ছুটি , ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয় হয় । তাই রাতে তেমন বাইরে যাওয়া হতো না । রাতে এখানে বার আছে । স্থানীয় লোকজন সপ্তাহে ২/১ বার বারে যায়। এখানে মানুষ বাংলাদেশের মত নিজেদের বাসায় কাউকে দাওয়াত তেমন একটা দেয় না । সামাজিকতা রক্ষা করার জন্য তারা বারে এসে কয়েক চুমুক বিয়ার বা অন্যান্য পানীয় খেয়ে গল্প গুজব করে সপ্তাহান্তে। বারে বিভিন্ন রকম খেলাধুলা যেমন ডার্ট থ্রো, কার্ড ,পুল ইত্যাদি খেলার সুযোগ আছে। আমার সাথে বোতসয়ানার এক ছেলে ছিল নাম রোনাল্ড, সে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ডিসকো কিংবা ক্লাবে চলে যেত । প্রায় শেষ রাত পর্যন্ত সে

ড্যান্স করত বিভিন্ন বান্ধবীর সাথে এবং শেষ রাতে চোখ লাল করে ফিরে আসত । প্রতিদিন দেখতাম তার চোখ লাল । সব পয়সা সে এই বাবে শেষ করত । আফ্রিকা থেকে এসে তাদের শাসকদের দেশে আনন্দ উপভোগ করছে এটাই তার আনন্দ । ব্রিটিশরা ও এর মত এত ঘন ঘন ক্লাবে বারে বা ডিসকোতে যেতে চায় না বা পারে না। সপ্তাহ গুলো ভালভাবেই কেটে যেত। সকাল বেলা উঠে নামাজ তারপর রেডি হয়ে নাস্তা করতে যেতাম। নাস্তায় সিরিয়াল দুধ, ব্রেড,বিভিন্ন ভাবে ভাজা ও সেদ্ধ ডিম বাটার জেলি কফি, ফ্রুটস ইত্যাদি থাকত। প্রথমেই এক গ্লাস জুস, এরা পানি তেমন একটা খায় না । পানি চাওয়াতে ছোট্ট একটা গ্লাসে পানি এনে দিল পরে ২ বার চাওয়াতে ওয়েট্রেস হেসে আমার জন্য এক জগ পানি নিয়ে এলো ।

খাড়া পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে বাস ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি ইনস্টিটিউশনে পৌছাত। বাইরে শীতের বাতাস ৬-৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা সাথে ইংলিশ চ্যানেল এর ঠান্ডা ঝড়ো বাতাস । রুমের ভেতর তা বোঝার উপায় নেই । মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয় ,মাটি প্রচন্ড আঠালো একবার পায়ে বা জুতাতে লেগে গেলে ওয়াটার স্প্রে ছাড়া পরিস্কার করা যায় না । ক্লাসের ফাঁকে ১০ মিনিট করে বিরতি। প্রত্যেকটা ব্লকে কফি মেশিন লাগানো আছে । মিল্ক চকলেট চা,কফি একই মেশিনে পাওয়া যায়। ২০ পেন্স ফেলে যা খেতে চাই সে বোতামে টিপ দিলে গরম পানি ,কফি, চা,চকলেট এর গুড়া কাপে এসে পড়ে এরপর গুলিয়ে নিতে হয় । চিনি আলাদা পাত্রে রাখা আছে পরিমান মত সবাই নিয়ে নেয় । লাঞ্চের জন্য একঘন্টা বিরতি তখন ক্যাফেটেরিয়াতে গিয়ে খেতে হয়, লেমন জুস যত খুশী এবং সবশেষে ফল, কাস্টার্ড বা ফ্রুট পুডিং জাতীয় মিষ্টি খাবার, পেট ভরে যায় এবং স্বাদ ও অপূর্ব , মাঝে মাঝে ব্রেড ও মাংসের টুকরা ও রান্না হয় ।

আমাদের বাসের ড্রাইভার ছিল বুড়ো ইংরেজ, এশিয়ানদেরকে তেমন পছন্দ করত না, ও দিকে জার্মান কিংবা অষ্ট্রেলিয়ান হলে হেসে কুটি কুটি , পারলে কালো বা এশিয়ানদেরকে সময় শেষ বলে ফেলে চলে যেতেও দ্বিধা করে না । দুই এক দিন ওকে ক্লাসের ফাঁকে দেখলাম কি করে দেখি । সারাদিন ছোট্ট একটা রেডিওতে কি যেন শুনে এবং বাসেই বসে থাকে । খেতেও যায় না কোথাও। একদিন ফাঁক পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি বাড়ীতে যাও না প্রথমে হাঁ না বলে কথা না বলার চেষ্টা করল। পরে বললাম তুমি লাঞ্চ করবে না । কিছুক্ষণের মধ্যে সে একটু ফ্রী হলে বলল বাড়ীতে বুড়ি ছাড়া কেউ নেই । ছোট্ট দুই রুমের বাসা , চাকুরী থেকে রিটায়ার এর পর একশত পাউন্ড মাসে পেনশন পায় এ টাকায় চলে না তাই বাস ড্রাইভারের চাকুরী নিয়েছে । কথা বলতে বলতে চোখ দিয়ে তার পানি চলে এলো । ছেলেরা বড় হয়েছে দুরে থাকে কোন খোজ খবর নেয় না । টাকা পয়সাও দেয় না । সকালে কিছু খেয়ে আসে আর সন্ধ্যায় গিয়ে খায় ।

আমাকে বলল এসব কথা যেন কাউকে না বলি । এদেশে মানুষের দুঃখের কথা কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করে না এবং কেউ বলেও না । এটাকে সম্পুর্ণ ব্যক্তিগত সমস্যা বলে মনে করে । এর পর থেকে আমাদের প্রতি তার আচরণ একদম পাল্টে গেল । রাস্তায় থেমে পারলে আমাদেরকে বাসে তুলে নেয় । হেসে কথা বলে ভালই লাগল মানুষের মন পরিবর্তন করতে পেরে ।

আরেকজন বাংলাদেশী ব্রিটিশ এর সাথে পরিচয় হয়েছিল ডাঃ আনিসুদ্দিন নাম । বাড়ী বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায়, ভারত ভাগের আগে ডাক্তারী পাশ করে লন্ডনে চলে আসে। এরপর একজন আইরিশ বংশোদ্ভুত ব্রিটিশ নার্সের সাথে প্রেম, প্রনয় ও বিয়ে। সে সুবাদে বৃটেনের নাগরিকত্ব পায়, তাও ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা । ষাটের উপর বয়স ভদ্রলোকের স্ত্রী ও সিনিয়ার নার্স হিসেবে রিটায়ার্ড করেছে । লন্ডনে একটা বাড়ী আছে। স্ত্রী থাকে ম্যানচেষ্টারে সেখানেও নিজস্ব বাড়ী আছে একটা । তিন মেয়ে । ভদ্রলোক বেশ কাল এবং দুঃখ করে বলেন মেয়ে গুলোও তার রং পেয়েছে । তবে স্বভাব চরিত্র এদেশের ,বিয়ে করেছে জার্মান ও অন্যান্য দেশের ছেলেদেরকে এখন মার সাথে যোগাযোগ করে । বাপকে পছন্দ করে না । প্রচন্ড একাকী ও কষ্টের জীবন তার । নিজে রান্না করে খায় তা না হলে বাইরে খেতে হয়। স্ত্রী ও মেয়েরা তার জন্য বিল গুলো পাঠিয়ে দেয় পে করার জন্য। শেষ জীবনে এসে তার দুঃখ আইরিশ মেয়ে বিয়ে করা ঠিক হয়নি । প্রথম জীবনে সবাইকে ইংরেজই মনে হতো, তখন এসব আইরিশ এংলো সেক্সন বুঝার মত সময় ও বয়স ছিল না। যৌবন এর টানে ভেসেগেছে তখন আর এখন দুঃখে বুক চাপড়াচ্ছে । দেশের কারোর সাথে যোগাযোগ রাখতে পারেনি । নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এখন বাংলাদেশেও তার কোন শুভাকাংখী নেই । দেশে গিয়ে একবার একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল । তার টাকায় জমি কিনে দিয়েছিল আত্মীয় স্বজনরা, ঘরও করা হয়েছিল । স্কুলের বোর্ড ও অন্যান্য সাজানো বাবদ অনেক টাকা খরচ করে ছিলেন তিনি । পরে লন্ডনে ফেরার আগে দেখেন যে কে যেন স্কুলের বোর্ড তুলে ফেলে দিয়েছে এবং এখানে এসে শুনতে পান সব বেদখল হয়ে গিয়েছে । মনের দুঃখে দেশের সাথেও যোগাযোগ করেন না । তাঁকে কেন যেন মানষিক রোগীর মত মনে হলো ।

পরের সপ্তাহে লন্ডন যাওয়ার জন্য রচেষ্টার ষ্টেশনে এলাম। টিকেট করে ৩০ মিনিট ট্রেনের জন্য অপেক্ষা । সব ট্রেন এখানে থামে না । ট্রেন এসে থামলে ষ্টেশনের দায়িত্ব প্রাপ্ত মাষ্টারকে লন্ডনের কথা বলতে ট্রেনে উঠতে বলল । এখানে ষ্টেশনে একজন মাত্র লোক । সেই টিকেট বিক্রি , সিগন্যাল দেয়া স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রাপ্ত । সব কাজ সে একাই সামলাচ্ছে

সুন্দর ভাবে । ৪০ মিনিটের মধ্যে লন্ডন ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে পৌছে গেলাম । ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন বিশাল এলাকা নিয়ে । এখানে ইন্টারসিটি ট্রেন ,পাতাল ট্রেনের বিভিন্ন লাইনের ট্রেন বদল করার ব্যবস্থা আছে । লন্ডন শহরে টিউব রেল সারা লন্ডনের নীচে দিয়ে চলছে । ৬ টা জোনে সমস্ত নেটওয়ার্ক ভাগ করা । বিভিন্ন এলাকায় যাবার জন্য বিভিন্ন লাইন আছে । টিউব এর সুদৃশ্য ম্যাপে বিভিন্ন রং দিয়ে এই লাইনগুলো দেখানো আছে । এত সুন্দর ম্যাপ ও গাইড বই গুলো দেখে যে কেউ লন্ডন শহর ঘুরে ঘুরে দেখতে পারবে । লন্ডনে বাংলাদেশীদের থাকার জন্য বাংলাদেশ সেন্টার আছে। এখানে লন্ডন প্রবাসীরা থাকে ও বাংলাদেশ সম্পর্কীত বিভিন্ন অনুষ্ঠান এখানে বা এদের তত্ত্বাবধানে করা হয়। বাংলাদেশ সেন্টারের কাছের টিউব ষ্টেশন নটিংহিল গেইট ।

নটিংহিল গেইট এলাকা

ভিক্টোরিয়া থেকে ম্যাপ দেখে নটিংহিল গেইট ষ্টেশনের জন্য রওয়ানা হলাম । পাতাল থেকে উপরে উঠেই দেখলাম ব্যাংক অব স্কটল্যান্ড, এর যে কোন এক পাশ দিয়ে গেলে বাংলাদেশ সেন্টার পাওয়া যাবে । ২/১ জন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম তখন এক মেয়ে বলল একটু এগিয়ে গিয়ে পাওয়া যাবে সেই ঠিকানা। তার বয় ফ্রেন্ড ছিল আফ্রিকান বংশোদ্ভুত, মেয়েটা আমাকে সাহায্য করেছে দেখে সে বিরক্ত বোধ করছিল । যাক জায়গা মত চলে এলাম । এখানে সব বাড়ীঘর এক রকম অনেক গুলো বাড়ী পাশাপাশি লাগানো । সবগুলো দোতলা সাথে বেসমেন্ট বা মাটির নীচের ঘর আছে ।

বাংলাদেশ সেন্টারে বাবু ভাইকে পেলাম উনি এখানের দায়িত্বে । সেন্টারের ৩ তলার একটা ঘরে থাকেন। ব্রিটিশ সিটিজেন, পড়াশোনা করার জন্য এসে পরে নাগরিকত্ব পেয়েছেন। আচার আচরণ বেশ ভাল এবং সাহায্য করার জন্য সব সময় প্রস্তুত । বেসমেন্ট এ রান্নার ব্যবস্থা । গ্রাউন্ড ফ্লোর এ ৩/4 টা রুম। ২ টা রুমে ৩ জন করে বোর্ডার এর থাকার ব্যবস্থা । আমি ৩ জনের রুমে

গেলাম । গেষ্ট কম ছিল তাই আমার সাথে আর কেউ ছিল না । রাতের বেলা তার সাথে কথা বললাম ,লন্ডন শহরের জন্য পাতাল রেলের ৭ দিনের টিকেট কিনে নিতে বললেন ৪ টা জোনের। এই জোনগুলোতে বেশী ষ্টেশন । বাকী জোনের কোন জায়গায় যদি যেতে ইচ্ছে করে তবে অতিরিক্ত টিকেট কিনে নিলেই হলো। একদিন দুইদিনের জন্য নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাওয়ার টিকেট কিনে নিলে সাশ্রয় হবে বলল । আমি পরবর্তী সপ্তাহে এসে প্রায় ২ সপ্তাহের মত এখানে থাকব বললাম । এখানে থাকা ও পরিবেশ বেশ আন্তরিক ও ভাল লাগল তাই এখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম । রাতের বেলা কে এফ সি'তে গিয়ে ডিনার করে নিলাম, রাতে আর তেমন ঘোরাফেরা করলাম না ।

বাবু ভাই অনেক বছর ধরে লন্ডনে আছেন । বাংলাদেশ সেন্টার ব্রিটিশ সরকারেরই একটা সংস্থার মত । এখানে প্রবাসী বাংলাদেশীরা তাদের সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ পায় । এরা মাঝে মাঝে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে । দেশ থেকে তিনি তার ভাইকে ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করার জন্য নিয়ে এসেছেন । ভাই রাতে কাজ করে ও দিনে পড়াশোনা । দু ভাই মিলে রান্না করে রাখে পরে কিচেনে এসে তা খেয়ে যায়। কিচেনে দেখলাম একটা রাইস কুকারে ভাত রাঁধা আছে । আরেকটা পাতিলে কলিফ্লাওয়ার ও গরুর মাংস রান্না করা। পাতিল থেকে কেকের মত ভাত এক পিস কেটে নিয়ে সাথে মাংস ও সব্জী এক চামচ নিয়ে খাচ্ছে পরে প্লেট চামচ ধুয়ে রেখে যাচ্ছে। আবহাওয়া এত ভাল এবং ঠান্ডা এমন যে ৩/৪ দিন এই একবার রান্না করা খাবার ওভেনে গরম করে খাওয়া যায় । অন্য কোন গেষ্ট যদি রান্না করতে চায় করার ব্যবস্থা আছে । আমি রান্নার বদলে বাইরে খাওয়ার পক্ষপাতি । কয়েকদিন আছি ঘুরে ফিরে সময় কাটাতে চাই । সকাল বেলা টিকেট করে বাংলাদেশ এম্বাসীর অবস্থান দেখে এলাম । নটিংহিল গেট থেকে দুই ষ্টেশন পরে নেমে একটু হেঁটে গেলেই বাংলাদেশের দুতাবাস , ছুটির দিন তাই সব বন্ধ । পাতাল রেল ষ্টেশনে পর্যটকদের জন্য র‍্যাকে রাখা বিভিন্ন ধরনের গাইড বুক ও বিভিন্ন জায়গা দেখার বর্ণনা সহ অনেক বই থেকে কিছু বই নিলাম । এছাড়া পাতাল রেলের ম্যাপ সংগ্রহ করলাম। এটা বেশ কাজে লাগে । রাত প্রায় ১১ টা পর্যন্ত এই ট্রেন চলে। লন্ডনে অবস্থান কালীন আমি প্রতিরাতে আটটার ভিতর রুমে ফিরে আসতাম। কারণ দোকান পাট প্রায় সব এ সময় বন্ধ হয়ে যায়। বিকেলে অফিস শেষ হওয়ার পর আস্তে আস্তে অফপিক আওয়ার শুরু হয় এবং ভীড় আস্তে আস্তে কমতে থাকে সেই সাথে অনেক ষ্টেশন বন্ধও হয়ে যায় ।

রাতে এসে গাইড বই গুলো পড়ে দর্শনীয় স্থান কি কি দেখব ঠিক করে নিলাম । আগামী সপ্তাহ থেকে ছুটি শুরু হবে তখন সে সব জায়গায় ট্রেনে করে ঘোরা যাবে । পরদিন

সকাল বেলা আবার ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন থেকে আমার গন্তব্য কেন্টের দিকে রওয়ানা হলাম । পরের শনিবার সমস্ত মালপত্র নিয়ে বাংলাদেশ সেন্টারে এসে হাজির হলাম । আগেই বলে রেখেছিলাম তাই আমার জন্য রুম রেখে দিয়েছিল একটা । টিউব ষ্টেশন থেকে ৭ দিনের ট্রাভেল পাস কিনলাম , দুইকপি ছবি চাইল। একটা ছবি টিকেটের এক পাশে প্লাষ্টিক এর পেপার তুলে লাগিয়ে দিল । সুন্দর কার্ড হোল্ডারে একপাশে টিকেট ও অন্য পাশে ছবি সহ পরিচয় পত্র কার্ড দিয়ে দিল । টিকেট পাঞ্চ করে ষ্টেশনে ঢোকার ব্যবস্থা । টিকেট চেকার আসলে ছবি সহ টিকেট দেখাতে হয় শুধু । প্লাষ্টিকের ছোট কার্ড হোল্ডারটা লাল রং এর, বেশ মজবুত, সাথে একটা ছোট হাত ব্যাগ, টিকেট , কোমরের বেল্টে টাকা পয়সা ও পাসপোর্ট ইত্যাদি নিয়ে লন্ডন শহর ঘুরে দেখার জন্য আমি প্রস্তুত ।সাথে সব সময় খাবার জন্য বিশাল ৪০০ গ্রামের ক্যাডবেরী মিল্কবার ও বোতলে পানি নিয়ে নিতাম । এরপরও যদি কিছু খেতে ইচ্ছে করত তবে টিউব ষ্টেশনের ভেন্ডার মেশিনে পয়সা ফেলে কোক বা পানি নেয়ার ব্যবস্থা আছে । বেশী খেতে ইচ্ছে করলে আশে পাশের কে এফ সির দোকানে ঢুকে লাঞ্চ প্যাক নিয়ে নিতাম।

কেন্টে থাকা কালীন টেশকো নামের বড় ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে যেতাম, সেভিং লোশন, রেজর, সাবান শ্যাম্পু, কোক পানি ইত্যাদি কেনার জন্য। এসব দোকান মনে হয় মধ্যবিত্ত লোকজনের জন্য এবং জিনিস পত্রের দাম তুলানামূলক ভাবে কম । টেসকোর নিজস্ব ব্রান্ডের জিনিষের দাম আরও কম । এসব দোকানের পাশে ছোট ছোট আরও দোকান আছে এগুলোতে দাম একটু বেশী হলেও অনেক লোকজন আসে কেনাকাটার জন্য । কারণ বড় দোকানে ঢুকলে অনেক সময় চলে যায়। লাইন ধরে পে করতে হয় ইত্যাদি অনেক সমস্যা আছে ।

লন্ডনে টিউব ষ্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেই ওই এলাকার দোকান পাট । একবার একটা দোকানে ঢুকলাম সেখানে দেখি সেলসম্যানরা কালো, আমি জিজ্ঞাসা করলাম আফ্রিকান কিনা, বলল ক্যারিবিয়ান । আমাকে বলল ভারতীয় কিনা আমি বললাম বাংলাদেশী । তারপর কিছু কেনাকাটা করলাম । টাকা বের করার সময় যখন ২০০/৩০০ পাউন্ড মানিব্যাগে দেখল তখন বলল ওহ তুমি তো বেশ ধনী। প্রথমে ধরে নিয়েছিল ভারতীয়রা কেনাকাটা করবে না । কথায় কথায় বলল অভিবাসী লোকজন আছে বলে লন্ডনে ৮ টার পরও এখন দোকান পাট খোলা থাকে ব্রিটিশরা ৮ টার পর কোন কাজ করতে চায় না । এরা ৮ ঘন্টা করে ডিউটি করে ঘন্টা ভিত্তিক বেতন পায় তেমন আহামরি কিছু না ।

লন্ডনের একটা জিনিষ ভাল লেগেছিল এদের কোয়ালিটি কন্ট্রোল, ভালো দোকান থেকে জিনিস কিনলে তা বেশ ভাল । তবে ফুটপাথ বা সস্তার দোকানে ইদানিং কমদামী গ্যারান্টি বিহীন জিনিষ

পত্রও পাওয়া যায়। লন্ডনের একটা ইউনিভার্সিটিতে এক বোন একই সময়ে এমফিল করার জন্য এসেছিলেন । তিনি একা হোষ্টেলে থাকেন, তাই আমার সাথে দেখা করার তাঁর খুব ইচ্ছা । তখন মোবাইল ফোনের প্রচলন তেমন ছিল না। কয়েন বুথ থেকে দেশেও কথা বলতাম এবং লন্ডনে কথা বলার জন্য কয়েন বুথ গুলো ছিল অন্যতম ব্যবস্থা । একদিন তাকে বললাম তিনি যেন তাঁর হোষ্টেল এর পাশের টিউব ষ্টেশনে থাকে । সময় যা দিলাম তা না জেনেই । পরে দেখলাম জায়গাটা বহুদুরে এবং নতুন একটা লাইন এ ট্রেন বদল করে যেতে হয় এবং সব সময় সার্কেল বা সেন্ট্রার লাইনের মত ট্রেন নেই । উনি আমার জন্য ঘন্টা দুই অপেক্ষা করে চলে গেলেন । পরে দুরত্ব যখন জেনে গেলাম সেভাবে সময় দিলাম । আমি ষ্টেশন থেকে বাইরে এসে দেখি উনি দাড়িয়ে । আমার জন্য অপেক্ষা করছেন । বলল সময় কাটে না । তাই আগেই বের হয়ে এসেছেন । তাঁর সাথে হেটে হোষ্টেলে গেলাম । নীচে নাম্বার লক লাগানো । দরজা খুলে লবিতে তারপর প্রতি ফ্লোরের জন্য আলাদা কোড নাম্বার , এরপর ব্লকের জন্য আলাদা নাম্বার । অবশেষে নিজের রুমের দরজার জন্য আলাদা নাম্বার আছে । উনার রুমে গেলাম একটা সিংগেল বেড, টেবিল চেয়ার টেবিল লাইট অর্থাৎ পড়াশোনার পরিবেশ । ব্লকের জন্য কমন রান্নাঘর আছে । সেখানে যে কেউ চাইলে রান্না করে খেতে পারে । ব্লকে বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্র ছাত্রী একসাথে থাকে । নিজস্ব রুম আছে সবার। সেখানে এক বাংগালী ছেলে মেয়ের দেখা হলো । ছেলেটা কলকাতা থেকে এসেছে ডাক্তারী পড়ছে,কালচে চেহারা মুখে দুই চারটা দাড়ি চুল একটু লম্বা একটু অগোছাল ভাব । মেয়েটার এদেশেই জন্ম ও বেড়ে উঠা বাবা মা ভারতীয়, এদেশের নাগরিক। ডাক্তার ছেলেটার সাথে মেয়েটার প্রেম ,মেয়েটার আগ্রহ অতিরিক্ত মনে হলো । ছেলেটার নাগরিকত্বও নেই। মেয়েটা ছেলেটার অতিরিক্ত যত্ন নিচ্ছে তবে ছেলেটা কেন যেন আমল দিচ্ছে না। তাদের গলাগলি বেশ লাগল মেয়েটা বাসা থেকে কি যেন নিয়ে এসেছে , দুজনে মিলে খাচ্ছে। কিছুক্ষণ গল্প করে আমরা বের হলাম আমার কেনাকাটা কিছু ছিল তা করলাম স্থানীয় স্লেজেনজার ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর থেকে । বিকেল বেলা আপাকে বিদায় জানিয়ে রুমে ফিরে এলাম ।

লন্ডনে থাকাকালিন বাংগালী ব্রিটিশ এক পরিবারে বেড়াতে গিয়েছিলাম, স্বামী স্ত্রী দুজনেই আর্কিটেক্ট ভাল বেতনে চাকুরী করেন । তাঁরা দুজনেই সৌদি আরবে চাকুরী করতেন বাচ্চাদের পড়াশোনার কথা ভেবে লন্ডনে চাকুরী নিয়ে স্থায়ীভাবে থাকতে এসেছেন । এদেশের নাগরিক , অভিজাত এলাকায় সুন্দর একতলা বাংলো টাইপ বাড়ী । ছেলে মেয়ে দুজনেই স্কুলে পড়ে । ভাইটা বোনকে সহ্য করতে পারে না । ছেলে ইংলিশ খাবার ছাড়া অন্য কিছু খায়না । মেয়ে বাবা মায়ের পছন্দের যে কোন খাবার খাবে ও বেশ ভাল । ছেলেটা বড় এবং বোনের সাথে কথাও বলে না ।

তার জন্য একটা ইংরেজ ন্যানী রেখেছে। সে এসে তাকে খাবার রান্না করে দেয় এবং অন্যান্য জিনিষ দেখা শোনা করে। যেহেতু বাবা মা দুজনেই ভাল আয় করে ও অভিজাত এলাকায় থাকে বাচ্চাদেরকে তেমন কোন বকাবকি করাও যায় না ,এতে বাচ্চারা যদি পুলিশ কে জানিয়ে দেয় তবে বাচ্চাকে সরকারের দায়িত্বে নিয়ে যাবে । অথচ এটা যদি ইষ্ট লন্ডনের কোন গরীব পরিবারের ছেলে হতো তবে এ আচরণ হতো না। বাধ্য হয়ে বাবা মা মেনে নিয়েছে । আমরা সবাই মিলে পাকিস্তানী রেষ্টুরেন্ট এ গেলাম । প্রায় ১ কিলোর কাছাকাছি দুরত্বে গাড়ী পার্কিং করতে হলো । হেটে এলাম সেখানে। গল্প গুজব করে নান, কাবাব ও অন্যান্য খাবার খেলাম প্রচন্ড দাম খাবারের । দুজনকেই দেখলাম তেমন সুখী না । অনেক অর্থ উপার্জন করছে অথচ মনে শান্তি নেই । সব পেয়েও যেন কিছুর অভাব রয়ে গেছে ।

বাংলাদেশ সেন্টারে খুব ভাল ভাবে আমার সময় কেটেছিল । বোর্ডার তেমন ছিল না । রুমে আমি একাই ছিলাম । সারাটা দিন বাইরে থাকতাম, টিউবে করে সারা লন্ডনের সব ষ্টেশনের আশেপাশে দেখা হয়ে গিয়েছিল। প্রতিদিন একটা টার্গেট সেট করে বের হতাম তারপর সন্ধ্যায় সব দেখে শেষ করে রুমে ফেরা । টিউবের ৭ দিনের ৪ টা জোনের টিকেট/পাশ কেনা আছে। পাতালে নেমে কার্ড পাঞ্চ করলেই ষ্টেশন। ট্রেনে উঠে যে কোন ষ্টেশনে নেমে যাই । পাতাল ফুড়ে উড়ে আসে পাশের এলাকা দেখে আবার পাতালে ডুব দেই। দিনগুলো ভালই কেটেছিল ।

বার্কিংহাম প্যালেস, লন্ডন

ইংল্যান্ডের রাণীর প্রাসাদ বার্কিংহাম প্যালেস দেখার সখ । এক সময় এরা আমাদের দেশ শাসন করত । কথায় বলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তখন নাকি কখনো সূর্য অস্ত যেত না । এখন ঠিক তার উল্টা। গত কদিন আকাশ মেঘলা থাকায় লন্ডনে সূর্যের চেহারাই দেখা যায়নি । ভিক্টোরিয়া মেট্রো ষ্টেশন থেকে বের হয়ে কিছু দুর হেঁটে গেলেই বার্কিংহাম প্যালেস এলাকা , ব্রিটিশ স্থাপত্যের

সুদৃশ্য প্রাসাদ । অনেক পর্যটক আমার মত ব্রিটিশ রাণীর প্রাসাদ দেখতে এসেছে। বিশাল লোহার গেট মাঝে তাদের চিহ্ন সোনালী রং করা । প্রাসাদে প্রহরী পরিবর্তনের জন্য একটা প্যারেড হয়, এটা বেশ আকর্ষণীয়। ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক চলছেই । সুন্দর সুন্দর ষ্টাচুর পাশে খোলামেলা জায়গা মানুষের ভীড়, অনেক দিনের সখ পুরন হলো । বেশ কিছুক্ষণ আশে পাশের এলাকায় ঘোরাফেরা করে ছবি তুললাম । এই প্রাসাদে বসবাসরত সম্রাট/সম্রাজ্ঞীরা দুইশত বৎসর ভারত শাসন করেছে । ভাবতে অবাক লাগে । গার্ড পরিবর্তনের যে আনুষ্ঠানিকতা তা দেখার মত । পরে দেখলাম এত জটলা সেই গার্ড পরিবর্তন অনুষ্ঠান দেখার জন্য । বার্কিংহাম প্রাসাদ এর ইতিহাস অনেক পুরানো । এটা ১৭০৩ সালে ডিউক অব বার্কিংহামের জন্য নির্মান করা হয়েছিল । পরবর্তীতে রাজা তৃতীয় জর্জ এটা তার রাণী ক্যারোলিন এর জন্য কিনে নেন । ১৮২০ সালে রাজা চতুর্থ জর্জ জন নাসকে একটা রাষ্ট্রীয় প্রাসাদ নির্মাণ করতে বলেন । বর্তমানের যে স্থাপত্য কলা ও অলকংরণ দেখা যায় তা তখনই রূপায়িত হয়েছিল । ১৮৩৭ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া প্রথম কোন রাণী হিসেবে এখানে বসবাস শুরু করেন এবং এটা সেই সময় থেকে রাজ পরিবারের লন্ডনের বাসস্থান হিসেবে পরিচিতি পায়। রাণী প্রাসাদে অবস্থানকালীন সময়ে ইউনিয়ন জ্যাক উড়ে।

বার্কিংহাম প্যালেস, লন্ডন

আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরে কিছু সময়ের জন্য এই প্রাসাদের কিছু কিছু অংশ মূল্যের বিনিময়ে জনগনের জন্য উম্মুক্ত করা হয় । প্রতিদিন বেলা ১১-৩০ মিনিটে গার্ড পরিবর্তনের আনুষ্ঠানিকতা হয় । এই বর্ণীল আনুষ্ঠানিকতায় ফুট গার্ডরা বিভিন্ন ধরনের মনোরম কসরৎ প্রদর্শন করে । এরা মূলত রাণীর ব্যক্তিগত প্রহরী, এরা সেনাবাহিনীর হাউসহোল্ড ডিভিশনের সদস্য । কর্তব্যরত গার্ডরা কর্তব্য শেষে যাওয়ার আগে প্রাসাদের সামনের কোর্ট ইয়ার্ড এ সমবেত হয় এবং নতুন কর্তব্যে আগমন কারী গার্ডদেরকে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয় । সাধারনত গার্ড বাহিনীতে তিন জন অফিসার ও চল্লিশ জন গার্ড থাকে । রাণী প্রাসাদে না থাকলে সংখ্যা কিছুটা কমে যায় । সবচেয়ে

বর্ণিল অনুষ্ঠান এর নাম ট্রুপিং দি কালার' এটা রাণীর অফিসিয়াল বার্থডে প্যারেড । রাণী গার্ড পরিদর্শন করেন ও অভিবাদন গ্রহন করেন । এটা বছরে একবার হয় এবং বহু লোকজন এটা দেখতে আসে।

বিগবেন, লন্ডন

এরপর বিগবেন, ব্রটিশ পার্লামেন্ট ও ১০ নং ডাইনিং স্ট্রীট এর কাছে বেড়ানোর পরিকল্পনা করলাম । বিগবেন ও পার্লামেন্ট ভবনের কাছে এসে সেই ছোট বেলায় শোনা ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম ।

ইউ কে পার্লামেন্ট, লন্ডন

আমি একা তাই ছবি তোলার লোক পাচ্ছিলাম না । হঠাৎ করে এক জাপানী ভদ্রলোক হাসিমুখে এসে তাঁর ছোট্ট ভিডিও ক্যামেরাটা দিয়ে আমাকে ছবি তুলে দিতে বললেন। আমি তুলে দিলাম ,বিনিময়ে তিনিও আমাকে আমার মিনোল্টা ক্যামেরাতে ছবি তুলে দিলেন । কথা হলো ভদ্রলোকের সাথে। আমাকে তাঁর কার্ড দিলেন। তিনি জাপানের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

বেশ বয়স্ক তবে বুঝা যায় না। তাঁর স্ত্রী প্রয়াত তাই একাই এসেছেন ইংল্যান্ড সফরে । আমাদের দেশের পর্যটক তেমন নেই ।

টেমস নদীর উপর ব্রিজ, লন্ডন ব্রিজ

লন্ডনে থাকাকালীন টেমস্ নদীর উপর সেই বিখ্যাত ব্রিজ দেখলাম জাহাজ এর নীচে দিয়ে যাওয়ার সময় ব্রিজটার দুই পার্শ্ব সরে যায় এবং জাহাজ চলে গেলে আবার আগের মত রাস্তা হয়ে যায় ও গাড়ী চলাচল করে । এখন অবশ্য এর নীচ দিয়ে তেমন জাহাজ চলে না । একটা জাহাজ টেমস নদীর উপর মিউজিয়াম হিসেবে রাখা আছে । দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের জাহাজ , এর পাশেই টাওয়ার অব লন্ডন নামে একটা প্রাসাদ । এখানে টিকেট করে ভেতরে যেতে হয় । আগেকার দিনের বন্দীদের নির্যাতনের জন্য এটা কুখ্যাত ছিল । একসময় সাধারণ জনতা এখানে আসতে ভয় পেত ।

প্রতিদিন যে কোন একটা জায়গায় যাওয়ার প্লান করে ম্যাপ দেখে সেখানে চলে যেতাম । টিকেট তো কোন সমস্যাই না। ৭ দিনের ট্রাভেল পাশ আছে সাথে। ইষ্ট লন্ডন বাংলাদেশীদের আস্ত না। ঠিক করলাম একদিন সেখানে গিয়ে তাদের অবস্থা দেখে আসব। পাতাল রেলে করে ঠিকই হাজির হয়ে গেলাম ইষ্ট লন্ডনে। লন্ডনের অন্যান্য জায়গা যেমন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এ জায়গাটা মনে হলো তার উল্টো। তবে এসব এলাকায় বাংলাদেশী বা ইন্ডিয়ান হোটেল গুলো বেশ বিখ্যাত । এখানে বিদেশীরা তাদের স্বাদ পরিবর্তনের জন্য আসে। ঘুরে ঘুরে মানুষের জীবন যাত্রা দেখাই ঠিক করলাম। ২/৩ টা বাংলাদেশীদের দোকানে গেলাম, সবাই প্রায় সিলেটি ,সিলেটি ভাষায় কথা বলে বাংলা বুঝে ইংরেজীতে উত্তর দেয় আমি নন সিলেটি বলে। দেখে কষ্টই লাগল । সাধারণ ছোট দোকান, পরিবেশ তেমন সুন্দর না । বেঁচে আছে প্রবাসে । অথচ দেশে এরা লন্ডনী। না জানি কত আনন্দ করে । হোয়াইট চ্যাপেল ও অন্যান্য বাংগালী এলাকায় ৪/৫ টা ষ্টেশনে গিয়ে উপরে উঠে আশেপাশের এলাকা দেখে আবার ফিরে এলাম রুমে । দ্বিতীয়বার আর যাওয়ার

প্রয়োজন বোধ করিনি । বাংলাদেশ সেন্টারে হঠাৎ ২ টি ছেলের সাথে দেখা হলো নাম জিজ্ঞাসা করায় ইংরেজীতে তার নাম বলল । বাংলা বলতে লজ্জা পায় কারন এখানে জন্ম ও বেড়ে উঠা। তাই সিলেটি ভাষায় কথা বলে বাংলাতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে না। বাংলাদেশীদের পরবর্তী জেনারেশন আইডেনটিটি ক্রাইসিসে ভুগছে । খুব কমই পড়াশোনায় ভাল করতে পারছে। এটা সত্যই দুঃখজনক ।

সেন্ট্রাল লন্ডনের এজওয়ার রোডের একটা হোটেলে থেকেছিলাম কয়েক দিন । হোটেলের রুমটায় একটা খাট রাখার ব্যবস্থা আছে । সেন্ট্রাল হিটিং উপরে একটা টিভি। চাপাচাপি করে বানানো এই হোটেল ভাড়া প্রায় ৫০ পাউন্ড এর মত। থাকা বেশ ব্যয়বহুল বেড এন্ড ব্রেকফাষ্ট অর্থাৎ সকাল এর নাস্তার বিল এর সাথে সংযুক্ত । হোটেলে সকালে সেলফ সার্ভিস নাস্তা । এখানে মঙ্গোলিয়ান মেয়ে নাওমীর সাথে দেখা। এ লেভেলে পড়ছে । পড়ার ফাঁকে ফাঁকে হোটেলে কাজ করে । কেমন লাগে জিজ্ঞাসা করায় বলল ভাল। পারিবারিক অবস্থা বেশ সচ্ছল। এখানে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে যাবে । বেশ হাসিখুশী। হোটেল রিসিপশনেও যারা বসে আছে তারা ভাল, তবে ব্যবহারটা কেমন যেন মেকী মনে হয় ।

হোটেলে সেট হয়ে খেতে বের হলাম। রাস্তায় জমে যাওয়া পানি দেখে মন খারাপ লাগল , কেএফসিতে ডিনারে গেলাম । প্রচন্ড ভীড় অনেক মানুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে , এক কর্ণারে গিয়ে আস্তে আস্তে ডিনার শেষ করলাম । তারপর আশে পাশের এলাকা ঘুরলাম। দোকান পাট কিছু কিছু খোলা আছে। একটা ছোট ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে ঢুকলাম । জিনিষ পত্র দেখছি হঠাৎ দেখি বাংলা কথা বলছে কয়েকজন ছেলে। বাংলাদেশ থেকে এসেছি জেনে খুশী হলো । এরা সবাই ভাল ফ্যামিলির ছেলে এখানে পড়তে এসেছে । এখন কাজ করে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছে, বেশ কষ্ট হচ্ছে। এখানে এরা সন্ধ্যার সময় এসে কাজ করে, দোকান গুছিয়ে দিয়ে যায় । একটা ইহুদীর দোকান এটা । কাজের বিনিময়ে ভাল মূল্য দেয় ও তার দোকান থেকে এরা যদি কিছু কেনে তবে দশ ভাগ ডিসকাউন্ট পায় এরা। তাদের এই সুবিধা দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগল । কিছু চকলেট কিনলাম তাদের ডিসকাউন্ট সুবিধা নিয়ে। বলল না জানিয়ে কোন কিছু যেন এখান থেকে না কিনি। সন্ধ্যায় ওরা থাকলে আমরা যেন জিনিষপত্র কিনি। দেশে ফেরার সময় সবাই মিলে চকলেট এর একটা প্যাকেট দিয়েছিল ওরা , কোন দাম নেয়নি অনেক সেধেছিলাম।

লন্ডনে এসে একটা ব্রিটিশ হোটেলে ইংলিশ খাবার খেতে এলাম । ব্রিটিশ ট্রাডিশন মেনে খাবার দিল। ভালই লাগল। দেশী খাবার এখন পৃথিবীর সব জায়গায় পাওয়া যায় বলে বিদেশী

খাবার খেতে হয় না বাংগালীদেরকে। তবে নতুন দেশে এলে সে দেশের খাবারের স্বাদ চেখে দেখা দরকার । রাতের বেলা একটা ইন্ডিয়ান রেষ্টুরেন্টে গেলাম। মালিক বাংলাদেশী এখানে ওয়েটার কয়েকজন আমাদের দেশী । একজন দেখলাম শুকনো ও বয়স্ক প্রায় ২০ বছর ধরে লন্ডনে আছে । অর্কিটেক্ট পড়াকালীন এখানে চলে এসেছে। দেশে বউ ও মেয়ে আছে, ২০ বছর দেখা নেই । যেতে পারে না । টাকা পাঠায় । এখানে সুবিধা করতে পারছে না । একটা কোর্স শেষে অন্য কোর্সে ভর্তি হয় এভাবে লন্ডনে দুঃসহ জীবন যাপন করছে। খুব খারাপ লাগল শুনে । বিদেশ নামের সোনার হরিণ কত জীবনকে যে গ্রাস করেছে তার খবর কে রাখে।

লন্ডনে আমাদের এক ভাই এর বাসায় যাব । ১০ টার দিকে ভাই গাড়ী নিয়ে এলেন । এই রাস্তায় উনি আগে কখনো আসেননি। প্রায় দেড় ঘন্টার মত লাগল ভাই এর বাসায় যেতে। রাস্তা ঘাট পরিচ্ছন্ন। সকাল বেলা রোড ফাঁকা ছিল । আমরা আসতে আসতেই বৃষ্টি, ঝুম বৃষ্টি হলো কিছুক্ষণ । বাসা থেকে আধা মাইলের মধ্যে একটা টিউব ষ্টেশনও আছে তবে তাতে কম যাত্রী চলাচল করে বলে সন্ধ্যায় বন্ধ হয়ে যায় । বাসাটা বেশ সুন্দর, আশে পাশে সব ডুপ্লেক্স বাড়ী, ভাল এলাকা । এন্ট্রিতে ছোট্ট একটু প্যাসেজ এখানে সবাই জুতা ও বাইরের কাপড় চোপড় খুলে ক্লিন হয়ে ঘরে ঢুকে । ঘর ময়লা হলে মেইনটিন করা কষ্ট বলে সবাই এখানে যতটা সম্ভব গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করে। ওদের এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলেটা ছোট । ভাই মোটামুটি ভাল অবস্থানে আছে । ভাবীরা আগেই এখানকার নাগরিক, এখন ভাইও একজন ব্রিটিশ নাগরিক। নিজের বাড়ী নীচের তলায় লিভিং রুম , সিড়ি ও ডাইনিং রুম। ভাবীর বাসার পিছনে এক চিলতে জায়গা। এখানে বিভিন্ন রকম শাক সব্জীর চাষ হয় । কাঁচা মরিচ, টমাটো দেখলাম সুন্দর ভাবে গাছে ফলন্ত। ভাই-ভাবীর সংগে কিছুক্ষণ গল্প হলো ভাবী অনেক আন্তরিক আমাদের জন্য অনেক রান্না বান্না করেছেন, মজা করে খেলাম । বিকেলে কিছুক্ষণ রেষ্ট নিয়ে আমরা বের হলাম । ভাই আমাদের টাওয়ার ব্রিজ ও লন্ডনের বড় নাগর দোলার পাশ দিয়ে নিয়ে গেলেন ও আশে পাশের এলাকা ঘুরে দেখালেন ।

লন্ডনে থাকা কালীন পিকাডলী সার্কাস এলাকায় গেলাম । এখানে মেট্রো ষ্টেশন বহু নীচে । এস্কেলেটরে ২/৩ বার করে নীচে নামতে হয়। এখান থেকে ট্রেন গুলো টেমস নদীর নীচে দিয়ে যায় । প্লাট ফর্ম অনেক নীচে। কৃত্রিম ভাবে বাতাস সরবরাহ করা হয় এইসব ষ্টেশনে । ষ্টেশনের বাইরে সুন্দর মুর্তি ও ফোয়ারা পর্যটক ও জনগন বসে গল্প করছে । আশেপাশে অনেক বার ও ডিসকো আছে । সেখানে যাওয়ার কোন ইচ্ছা নেই । ঘুরে ফিরে চলে এলাম । হ্যারডস ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরের নাম শুনেছিলাম, লন্ডনে এসে তাই সেটা ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করল । যেই কথা

সেই কাজ, রওয়ানা হলাম । বেশ সুন্দর ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর, ট্রাডিশনাল স্থাপনা, সব কিছুতেই হ্যারডস্ এর ছাপ । ষ্টোরে ঢুকলাম, থরে থরে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সুগন্ধি সাজানো আছে । যে কেউ ইচ্ছে করলে স্প্রে করে গন্ধ দেখে নিতে পারে । শত শত রকমের স্প্রে করে সুগন্ধীতে গোসল করে বেরিয়ে আসতে পারে । এগুলো হলো টেষ্টার, কোনটা পছন্দ হলে তবেই দাম পুষিয়ে কিনে নিতে হয় । হ্যারডস্ এ বাইরের চেয়ে যে কোন জিনিষের দাম ৫/১০ গুন বেশী । ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন অংশ দেখছিলাম শেষে ফেরার পথে একটা কেক কিনলাম । সুন্দর ভাবে প্লাষ্টিক এর মোড়ক জাত একটা সীল লাগানো আছে হ্যারডস এর। দেখতেই অভিজাত লাগে । সখ ছিল দেখে এলাম । আমাদের দেশে তখন মার্কস এন্ড স্পেনসর এর কাপড় চোপড়ের বেশ সুনাম ছিল । লন্ডনে তাই মার্কস এন্ড স্পেন্সর এর দোকানে গেলাম । তিন তলা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর । বাচ্চাদের, মহিলাদের ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা সেকশন, স্যুট দেখলাম বেশ সুন্দর, ক্লিয়ারিং সেল চলছিল । সি এন্ড এ নামেরও এমনি একটি ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর আছে । এখানেও কাপড় চোপড় পাওয়া যায় । ছোট খাট ২/১ টা জিনিষ কিনলাম । আমাদের দেশে জামাকাপড় অনেক সস্তা । তারপরও লন্ডন থেকে কেনা কাটি করা এই যা । আমাদের দেশের লোকজনকে দেখলাম বেড়াতে এসে এসব দোকান থেকে স্যুট শার্ট ইত্যাদি কিনছে।

ন্যাচারাল হিষ্টোরী মিউজিয়াম, সাউথ কেনসিংটন

ন্যাচারাল হিষ্টোরী মিউজিয়াম সাউথ কেনসিংটনে ক্রোমওয়েল রোডে অবস্থিত বিশাল বিল্ডিং । অনেকগুলো সিড়ির ধাপ পেরিয়ে এন্ট্রিতে যেতে হয় । সপ্তাহে প্রায় সবদিনই এটা খোলা থাকে । ১৮৮১ সালে এটা জনগনের জন্য চালু হয় । এটা দেখতে অনেকটা সুন্দর ক্যাথেড্রাল এর মত । প্রাচীন কালের পৃথিবীর অবস্থা, জীবজন্তু প্রাণীদের ডিসপ্লে রয়েছে। ভুমিকম্প, অগ্নুৎপাত ইত্যাদি সিমুলেশন এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে । পুরো মিউজিয়ামটা অনেক ভাগে বিভক্ত । ডাইনোসর এর

জন্য একটা গ্যালারী আছে। ছবি এবং মানব দেহের কংকাল এর বিশাল গ্যালারী আছে । মোটামুটি একবার ঘুরে আসলে পৃথিবী ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান লাভ করা যায় । ঘুরতে গেলেও ভাল করে দেখতে হলে সারাদিনই চলে যাবে। ঘুরতে ঘুরতে টায়ার্ড হবার জোগাড়। দুই/তিন ঘন্টা ঘুরে টায়ার্ড হয়ে ফিরে এলাম গেইটে। বাইরের বাতাস নিলাম ।

লন্ডনে সানডে মার্কেট বলে একটা বাজার বসে। লোকজন বাসায় বানানো খাবার দাবার ,হাতের কাজের জিনিষ পত্র এখানে এনে বিক্রি করে। বাসার গ্যারেজে বা কোন খোলা জায়গায় ছাতার নীচে অথবা যে কোন ধরনের টেম্পোরারি তাবুর ব্যবস্থা করে পশরা সাজিয়ে বসে । বহু লোকজন এখানে কেনাকাটা করতে আসে। পর্যটকদের জন্য আরেকটা ভাল ব্যবস্থা এখানে দেখলাম বিবি বা বেড এন্ড ব্রেকফাষ্ট । লোকজন নিজের বাসার অব্যবহৃত রুমটা এক রাতের জন্য পর্যটকদের কাছে ভাড়া দেয় । সাথে সকালের নাস্তাও বানিয়ে খাওয়ায় । যে কেউ লন্ডনে এসে হোটেলে না থেকে পারিবারিক আতিথেয়তায় সময় কাটাতে পারে স্বল্প খরচের বিনিময়ে। অনেক জায়গায় এ রকম হাতে লিখা কিংবা বানানো বোর্ডে এই কথা লিখা আছে দেখা যায় । সেপ্টেম্বর - অক্টোবর মাসে লন্ডনের শীত তেমন তীব্র না। বৃষ্টিও হতো মাঝে মাঝে, বাতাস বেশ ঠান্ডা তাপমাত্রা ৭-৯ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, আমাদের দেশের তুলনায় বেশ ঠান্ডা, তাই জ্যাকেট পরেই থাকতে হতো।

লন্ডনের আরেকটা সমস্যা হলো ট্রাফিকজ্যাম , সেন্ট্রাল লন্ডন থেকে হিথরো এয়ার পোর্ট যেতে টেক্সিতে করে প্রায় ২ থেকে আড়াই ঘন্টা লেগে যায় জ্যামের কারনে অথচ পাতাল রেলে ট্রেন চেইঞ্জ করে হিথরোর ৪ টা টার্মিনালের মধ্যে যে কোন টাতে যেতে ৪০ মিনিটের মত সময় লাগে এবং ভ্রমণও বেশ আরামদায়ক । পাতাল রেলের বগিগুলো বেশ সুন্দর, বসার জন্য সিট আছে। দাড়িয়ে থাকার জন্য হাতল ও ধরে রাখার সাপোর্ট দেয়া আছে । ষ্টেশনে ট্রেন আসলে দুম করে দরজা খুলে যায় । প্রথমে লোকজন নামে তারপর উঠে। রেকর্ড করা ওয়ার্নিং বাজে যে দরজা থেকে দুরে থাকুন দরজা বন্ধ হবে । এরপর দুম করে দরজা বন্ধ হয়ে যায় । ট্রেনে পরবর্তী ষ্টেশনের কথা ঘোষণা করে । এছাড়া বগিতে ট্রেন লাইন ও ষ্টেশন এর ম্যাপ আছে । কোন ষ্টেশনে অন্য লাইনের ট্রেন পাওয়া যাবে তাও রং এর মাধ্যমে বোঝানো আছে । সেন্ট্রাল, সার্কেল, পিকাডেলী, হ্যামার স্মীথ এন্ড সিটি ইত্যাদি আরো অনেক লাইন কালার কোড এর মাধ্যমে বোঝানো আছে । যে কেউ তা বুঝতে পারবে এত সহজ ।

লন্ডনের দিন গুলো শেষ হয়ে আসছিল আমিও মোটামুটি ঘোরাফেরা করে বেশ তৃপ্ত। খাওয়া দাওয়া , বেড়ানো থাকা সব কিছুই বেশ সুন্দর ভাবেই হচ্ছিল । যথা সময়ে বিদায়ের পালা, মালপত্র নিয়ে পাতাল রেলে হিথ্রো এয়ারপোর্ট চলে এলাম । টার্মিনাল চার থেকে বিমান

এর ফ্লাইট উড়াল দেয় । চেক ইন করলাম, তেমন কোন সমস্যা হলো না । তবে ব্যাগটা তারা পুরোপুরি খুলে চেক করল । যথারীতি সব কাজকর্ম শেষ করে অপেক্ষার পালা। আমি ফিরছি আমার স্বদেশে, প্রিয় দেশে, হোকনা তা প্রথম বিশ্বের কোন দেশ নয় । ওটাই আমার দেশ বিমানে উঠে মনে হলো দেশে এসে পড়েছি । "আকাশে শান্তির নীড়" সত্যিই বেশ ভাল লাগল ।

স্মৃতিতে রংগীন হয়ে থাকল ইংল্যান্ডের কয়েকটা দিন ।

shovonshams@yahoo.com